চিরকুট ২৬

নাস্তিকতা কি? এ ছিল আজন্ম একটা প্রশ্ন। বিশেষ করে জন্মসূত্রে একটা ধর্মবলম্বী হওয়ার পরও সব সময় বিপরীত দিকটা দেখার প্রবল আগ্রহ ছোট বেলা থেকেই মনের মধ্যে কাজ করতো। যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম এতদল লোক নিজেদের শিক্ষিত বলে প্রচার করতে গিয়ে ধর্মের বিষয়ে অবজ্ঞা করে কথা বলতে বেশ আনন্দ পেত - বিশেষ করে ধার্মিক মানুষদের পশ্চাৎপদ হিসাবে দেখাতে তাদের বিপুল উৎসাহ কাজ করতো। সমস্যা হচ্ছে তাদের কিছু গৎ বাধাঁ বুলি আর সমালোচনা ছাড়া তেমন বিশেষ জ্ঞান রাখতো না। যেমন বিভিন্ন বিশেষ সময়ে ওজু করা বা আবু লাহাবকে কেন আমরা অভিশাপ দেব ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন ভাবেই সেগুলোকে একটা সুস্থ বা সংগঠিত আদর্শ বা দর্শন হিসাবে মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হতো না- একমাত্র আতেঁলদের আড্ডার খোরাক ছাড়া। তারপর কয়েকজনের লেখা পড়ে মনে হতো তারা কেবল লেখার জন্যে লেখে - সমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এদের দর্শন কম। এ অবস্থায় প্রথম যখন মুক্তমনা ওয়েব পেজের লেখা পড়া শুরু করি তখন একটা প্রবল আগ্রহ নিয়ে শুরু করেছিলাম। হয়তো নাস্তিকতা নামক মতবাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতে পারবো। যত দিন যেতে থাকলো তত হতাশ হলাম। এ কি, এ যে বিশেষ একটা ধর্মের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডার মেশিন। এক পর্যায়ে একটা ছোট্ট প্রতিবেদন তৈরী করেছিলাম যাতে দেখা গেছে মুক্তমনায় প্রকাশিত সে সময়ের লেখার ৮০%ই মুসলমান বা ইসলামকে হেয় করার জন্যে লেখা। তার মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রচারকের বেড রুমের নিখুঁত বর্ননার তথ্য চিত্র, কোরআনের মনমতো ব্যাখ্যা আর বর্তমান বিশ্বের অস্থির অবস্থার জন্যে একমাত্র মুসলমানদের দায়ী করে বিস্তর লেখা। মনে একটা প্রশ্ন থেকেই গেল - নাস্তিক হলেতো প্রাথমিক ভাবে তাদের কিছু যুক্তি বা দার্শনিক ভিত্তি থাকবে যার উপর দাড়িয়ে হাজার বৎসরের ঈশ্বরের বিশ্বাসের বিপক্ষে একটা পরিষ্কার পথ দেখানো যাবে। কিন্তু হায় হতাশ। নাস্তিকদের আদর্শ পুরুষরা যখন মারা যায় তখন তার সমর্থকরা পুলিশের সহায়তায় কোন একটা ধর্মের পুরহিতদের দিয়েই শেষ কৃত্য সমাধা করেন। এর কারন হচ্ছে, তারা নিজেরাও জানেন না মৃত্যু কি এবং এরপর কি হবে। এ জন্যে বিভ্রান্ত সমর্থকদের দেখা যায় মৃত মানুষটি সারা জীবন যাদের বিরুদ্ধে কথা বলে গেছেন তাদের একজনের হাতে তার মৃতদেহটা তুলে দিতে। এটা খুবই হতাশা আর দুঃখের কথা। আর ইদানিং দেখতে পাচ্ছি নাস্তিকরা ধর্মের যতটুকু তার দরকার ততটুকু বিশ্বাস করতে কুন্ঠিত নয়।

যেমন কয়েকদিন আগে টরন্টোর এক স্থানীয় টিভিতে হাসান মাহমুদ (ফতেমোল্লা) আর ডঃ তাজ হাসমীকে দেখা গেল। তারা এসেছিলেন অন্টারিওর প্রস্তাবিত শরিয়া আদালতের বিরোধীতা করতে। শরিয়া আদালতের প্রকৃত আদল না বুঝেই শুধু মাত্র বিরোধীতার জন্যে বিরোধীতা করা আরকি। যেমন, ৯/১১ এর পরও কানাডা সরকার শারিয়া আদালত আদালতের অনুমোদন দিচ্ছেন কেন? কারন সাংবিধানিক অনুমোদন নিয়ে ইহুদী আর খৃষ্টানরা দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের নিজস্ব আরবিটেশন আদালত চালাচ্ছে - সুতরাং সংবিধান পরিবর্তন ছাড়া মুসলমানদের আদালত বন্ধ করা যাবে না এটা বুঝার ক্ষমতা না থাকা আর ইহুদী মালিকানাধীন মিডিয়ার প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে কিছু মুসলমান নামধারী এর হাস্যকর বিরোধীতায় নেমেছে। এতে হাসির খোরাক হচ্ছে সমগ্র মুসলমান কমিউনিটি। মজার বিষয় হচ্ছে এটা কোন আদালত না - এটা একটা ভলানটারী আরবিটেশন বডি যার সমস্ত সিদ্ধান্ত কোর্ট কতৃক অনুমোদন নিতে হবে। সুতরাং বাঙলাদেশের গ্রাম্য আদালত আর টরোন্টোর শারিয়া আদালত যে এক নয় সেটা যাদের বুঝার ক্ষমতা নেই তাদের কথা আলাদা। একটা কথা পরিষ্কার - যদি সংবিধানের আওতায় একটা ধর্ম গোষ্ঠি কোন সুবিধা পায় তবে বিশেষ কোন ধর্ম গোষ্ঠির জন্যে সে সুবিধা না দেওয়া সভ্যতার আর গনতন্ত্রের পরিপন্থী সে জ্ঞান যে মুক্তমনাদের নেই সেটাই অবাক হবার বিষয় বটে। যা হোক, অনুষ্ঠানে পুরোটাই হাসান মাহমুদ ব্যয় করলেন এ বলে যে শারিয়া কোরানের বিকৃত ব্যাখ্যায় ভরা - তাই শারিয়া গ্রহনযোগ্য নয়। অর্থাৎ কোরান নিয়ে কোন সমস্যা নেই তার। এ অবস্থায় উপস্থাপক জিজ্ঞাসা করলেন - কোরান অনুসারে যদি সে আদালত চলে তবে কি কোন অসুবিধা আছে । হাসান মাহমুদের উত্তর - না। সুতরাং যারা হাসান মাহমুদকে নাস্তিক দলে ফেলতে চান তারা একটু ভাববেন, কারন তিনি কোরান বিশ্বাস করেন কিন্তু শারিয়া বিশ্বাস করেন না।

অন্য একজন - যিনি ইরাক যুদ্ধের সমর্থনে কথা বলে বলে নিজেকে বুশের একটা ছোট ভার্সান ভাবতে শুরু করেছেন তিনি হচ্ছেন কামরান মির্যা। তিনি কোরানের অংশ বিশেষ বিশ্বাস করেন যাতে বেহেস্তে গেলমান বা বালকদের রাখা হবে "গে" দের জন্যে বলে নাকি বলা আছে - কিন্তু তিনি কোরান বিশ্বাস করেন না।

এ হচ্ছে তথাকথিত নাস্তিকদের অবস্থা।

গত চিরকুটে (চিরকুট ২৫) এর কিছু মন্তব্য পাঠকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে – এতে অনেকে কষ্ট পেয়েছেন। বিশেষ করে অভিবাসন বিষয়ক মন্তব্য কয়েকজনকে আহত করেছে। এটা কোন ভাবেই আমার লেখার উদ্দেশ্য ছিল না কাউকে কষ্ট দেওয়া – বিশেষ করে ব্যক্তিগত বিষয়েতো নয়ই। প্রসংগক্রমে অভিবাসনের কথা বলতে গিয়ে মোহাম্মদ আসগরের নাম নেওয়ায় তিনি একটা দীর্ঘ মেল করে জানিয়েছেন অন্ন কষ্টের কারনে তিনি দেশত্যাগ করেননি। বিশাল প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকেও তিনি বিশেষ কিছু কারনে দেশ ত্যাগ করেছেন। সে প্রসংগ পরে হবে। এখন আমার সে বক্তব্যের একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করি। তার আগে কোন ভাবে যদি লেখাতে কেহ কষ্ট পেয়ে থাকেন তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

অগ্রগামী অভিবাসী হিসাবে প্রতি বৎসর আমাকে ২/৩ বার টরন্টোর পিয়ারসন্স এয়ারপোর্টে যেতে হয় নতুন অভিবাসীদের গ্রহন (Receive) এবং প্রাথমিক বিষয়গুলো যেমন বাসস্থান, গৃহস্থালী ক্রয়সহ অনুষাঙগিক কাজ করতে হয়। এটা একটা মজার কাজ এবং একটা আনন্দের কাজ। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, যারা ইমেগ্রেশন নিয়ে কানাডায় আসেন তারা মোটামুটি উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত এবং এ জন্যে তাদের যথেষ্ট খরচ করতে হয় – তার মানে আজগর সাহেবের মতো তাদের যথেষ্ট সম্পদ না থাকলেও তাদের অন্ন কষ্ট নেই এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। মজার বিষয় হচ্ছে তারা এয়ারপোর্টে নামার পর থেকে ক্রমাগত কথা বলতে থাকেন আর বিষয়বস্তু ”বাংলাদেশ আর বসবাসযোগ্য নেই”। তার পক্ষে প্রমান ও যুক্তির খই ফোটতে থাকে। প্রথম প্রথম বুঝতাম না কেন এ রকম করেন এরা। পরে মোটামুটি একটা ব্যখ্যা পেয়েছি যা আশা করি পাঠকগন আমার সাথে একমত হবেন। মনে করুন একটা পরিবার ইমিগ্রেশন নিচ্ছে যার স্বামী একজন প্রকৌশলী আর স্ত্রী একজন চিকিৎসক। সুতরাং বাঙলাদেশের প্রক্ষাপটে একটা ভাল সামাজিক এবং আর্থিক (সৎ বা অসৎ এখানে বিবেচ্য নয়) অবস্থানে থাকেন। তাদের বাচ্চাটাকে ম্যাপেল লীফ স্কুলে বা ভিকারুন্নিসায় দিতে পেরেছে। এ অবস্থা থেকে একটা স্বপ্নের দেশে অভিবাসেন জন্যে তাদের যে মানসিক শক্তি অর্জন করতে হয় তার জন্যে একটা প্রচন্ড নেতিবাচক শক্তিতে তার বর্তমানটাকে দুরে সরাতে হয়। অনেকটা রকেটের মতো– প্রচন্ড বেগে বায়ুমন্ডলকে বিপরীত দিক থেকে ধাক্কা না দিলে যেমন সামনে যেতে পারে না – তেমনি অভিবাসীরা দেশ সম্পর্কে প্রচন্ড নেতিবাচক মনোভাব তৈরী করতে না পারলে দেশ ছাড়ার মতো কষ্টকর কাজটা করতে পারে না। পরবর্তীতে দেখা যায় খুব দ্রুত হোমসিক হয়ে যায় – এবং আমাকে একটা অতিরিক্ত সার্ভিস দিতে হয় – যা হচ্ছে একটা কম্পিউটার কিনে তাতে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে বাংলাদেশের দৈনিকগুলোকে বুকমার্ক করে দেওয়া। আমার এ অভিজ্ঞতার থেকে যা পেয়েছি তার সবগুলোই আসগর সাহেবের সাথে মিলে যায় – অর্থাৎ তারা দেশ ত্যাগের যে যে কারন দেখায় তার সবগুলোই আসগর সাহেবের সাথে হুবুহু এক – শুধু একটা ছাড়া আর সেটা হচ্ছে মৌলবাদের উত্থান। তবে একদল মানুষকে কিন্তু কাগজে কলমে মৌলবাদের জন্যে দেশ ছেড়েছে বলে প্রমান করতে হয় – কারন বর্তমানে কনভেনশন রিফিউজী স্টেটাস পেতে এ বিষয়টা বেশ সুবিধা দেয় বলে শুনেছি।

এটা পরিষ্কার হওয়া জরুরী যে অভিবাসন কোন নতুন বিষয় নয় – মানুষসহ প্রানীকুলের সব সদস্যই প্রকৃতিক কারনে অভিবাসন করে। এক সময় ইউরোপীয়ানরা অভিবাসিত হয়ে তৈরী করেছে কানাডা, আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড বা অস্টেলিয়ার মতো দেশ। এ দেশ গুলো বিনির্মনে পৃথিবীর সব ধর্মের আর বর্ণের মানুষের অবদান আছে। আমেরিকা যেমন আফ্রিকান কালো মানুষদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে তেমন কানাডা চীনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে চিরকাল। আর আমরা যারা এদেশে এসেছি – তা কারো করুনা বা দয়ায় নয় । এটা এদিকে যেমন তাদের প্রয়োজনে আমাদের আসতে দিয়েছে – অন্যদিকে আমরা আমার মেধা আর শ্রম বিক্রয়ে ভাল বাজার হিসাবে এখানে এসেছি। আমি যদি আমার শ্রম আর মেধা বিক্রয় করে সমমানের জীবনের নিশ্চয়তা যেখানে পাবো আজই যেখানে যাবো – সেটা আমেরিকা বা আফ্রিকা বিবেচনা করবো না। সমগ্র পৃথিবীই আমার। বাংলাদেশে জন্ম নেওয়াটা আমার অপরাধ নয় – যে সে অপরাধে আমি ভাল জীবন যাপন করতে পারবো না। এখানে একটা বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে আমি আমার গলায় একটা বড় প্লেকার্ড ঝুলিয়ে যত জোরই চেচাই না কেন আমি একজন ভাল ক্যানাডিয়ান – তাতে আমি ভাল ক্যানাডিয়ান হবো না যদি আমার ট্যাক্স আর ক্রেডিট বিষয়ক সমস্যা থাকে। এখানে মুল বিষয়টা হচ্ছে আমি কাজ করি ট্যাক্স দেই আর সরকার সে টাকা দিয়ে বাজেট করে। সুতরাং আমাকে কর্মপোযোগী রাখাটা সরকারের জন্যে জরুরী। যদি এ সত্যটা বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশের নেতারা বুঝতেন তা হলে আমাদের হয়তো এ দেশে আসতে হতো না।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ হচ্ছে উৎপাদনের যন্ত্র আর সে যন্ত্র যেখানে সস্তায় পাওয়া যাবে পুঁজি সেখানে যাবে। এ অবস্থায় দেখুন আমেরিকায় প্রতি বৎসরে মিলিয়ন মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে শুধু মাত্র লো-কস্ট জিওগ্রাফীর নামে সস্তা শ্রমের লোভে পুজিঁ ধাবিত হচ্ছে চীনের দিকে তখন দেশপ্রেম কি তাদের ধরে রাখতে পারছে আমেরিকায়। এ সময় যদি কেহ দেশ প্রেমিক আমেরিকান হিসাবে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে তখন বুঝতে হবে হয় সে বর্তমান বুশ চক্রের কৌশলী জাতীয়তাবাদের প্রপাগান্ডার শিকার । ২য় বিশ্বযুদ্ধের আগে হিটলারও এমনই জাতীয়তাবাদে জার্মানীকে উন্মাদ করে ফেলেছিল। একদিকে স্বদেশে লক্ষ মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে, বড় বড় কর্পোরেশনগুলি জনগনের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিন খেলছে, সরকার দেশে বিদেশে যুদ্ধে এবং নৈতিক ভাবে পরাজিত- এ সময় উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার ছাড়া নির্বাচনে বৈতরনী পার পাওয়া যে বুশ চেনীর পক্ষে সম্ভব নয় এটা একটা সাধারন মানুষ বুঝলেও বুঝেন না মুক্তমনাদের পাঠ্যপুস্তক প্রনেতা কামরান মির্যা।

এমনই একজন মানুষ কৃষিবিদ কামরান মির্যা। তিনি আমেরিকায় বসবাস করতে পেরে এমনই আহ্লাদিত যে নিজের অতীতকে দ্রুত মুছার জন্যে সবেগে লেজ নাড়ছেন আর তার মৃদু মন্দ বাতাস সদালাপের গায়ে লেগেছে বলে তার প্রসংগ কিছু কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি। "টানেল ভিষন" এ ভোগা এ ভদ্রলোকের ট্যানেলের এ দিকে আমেরিকা আর অন্যদিকে মুসলমান। সমস্যা হচ্ছে এ ধরনের শিকড়বিহীন শৈবালের সমস্যা বানের সময় বেশী হয় - বিশেষ করে নৌকার মাঝিদের বিরক্ত করে। সেপ্টেম্বর ১১ এর পর এ ধরনের আগাছার সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে ইন্টারনেটে - যারা নিজেদের অতীতকে দ্রুত মুছে ফেলে শক্তির পুজার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে চায় তেলাপোকার মতো।

আসুন পাঠক তথাকথিত মুক্তমনাদেরর মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী লোক বলে দাবীদার (প্রয়াশই তিনি অন্যদেরকে অশিক্ষিত বলে জ্ঞান করেন) সাঈদ কামরান মির্যার সর্বশেষ লেখার কিছু দিক দেখি যা তার মানসিক সুস্থতাকে প্রশ্নের সন্মুখিন করে। ভিন্নমতে প্রকাশিত হয়েছে তার অদ্ভুদ বাংলায় লেখা (২১ এর শহীদের আত্মা তাকে ক্ষমা করুন) "আমেরিকার প্রেশিডেন্ট নির্বাচন মুসলমানের উভয় সংকট" (সাঈদ কামরান মির্যা) । পাঠক, লক্ষ্য করুন - মনে হচ্ছে না, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলমান নামক এক জন ব্যক্তির বিশেষ সমস্যা হচ্ছে। আমার মনে হয় তিনি বুঝাতে চেয়েছেন মুসলমানদের উভয় সংকট।

আমেরিকায় যেই প্রেসিডেন্ট হোক না কেন - আমেরিকান তেলের খরচ যা দৈনিক ১৯ মিলিয়ন ব্যারেল তার থেকে এক ব্যরেলও কমাতে পারবে না। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে তেমন কোন পরিবর্তন হবে বলে যদি কেহ বিশ্বাস করেন তবে তার সাথে বাজীতে যেতে রাজী আছি। যদি নির্বাচিত হয় তবে সামান্য সুগার কোটিং ছাড়া জন কেরী তেমন কিছু করতে পারবেন না এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। এর প্রমান হচ্ছে গত সপ্তাহের "President's Debate" – যেখানে কেরী আর বুশ দুজনকেই একটা বিষয়ে একমত হতে দেখা গেছে তা হচ্ছে "ইসরায়েলের নিরাপত্তা"। বুশ বললেন - ফ্রী ইরাক মানে নিরাপদ ইসরায়েল আর কেরীও সেটা সমর্থন করলেন। এখানে প্রসঙ্গিক ক্রমে একটা কথা বলা দরকার। ইরাক যুদ্ধের আগে একজন অতিআমেরিকান বাঙালী ইরাক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বিষয় রচনায় ইসরায়েলের নিরাপত্তার পয়েন্টটা যোগ করেননি - এবার তা করতে পারেন কারন এটা কোন ইসলামিষ্টদের কথা নয় আর - খোদ আমেরিকান দুই প্রধান ব্যক্তির কথা।

আবারও মির্যা সাহেবের লেখার বিষয়ে আসা যাক। "বুশ -চেনীর দুর্মুজ পার্টির" প্রতি আপনার নতজানু অবস্থান থেকে আপনি "সদালাপী" ভাইদের কাছে কিছু প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর খুজঁতে গিয়ে কিছু বিষয় আমার কাছে খটকা লাগলো বলে নিচে দিয়ে দিলাম।

প্রথমতঃ আপনার অতি প্রিয় "ডেইজী কাটার" নামক আমেরিকান অস্ত্র গুলি কাকে মারছে? ইসলামীস্টদের ? দেখুন রয়টারের প্রতিবেদন - Of the 70 dead brought to Samarra General Hospital since fighting erupted, 23 were children and 18 were women, hospital official Abdul-Nasser Hamed Yassin said Sunday. Another 160 wounded people also were treated. (Oct 04, 2004)

এবার দেখুন নীচের ছবি - আপনার অন্নদাতা আমেরিকান সৈন্যদের নির্ভল টার্গেট কে? নীচের ছবি কি আপনাকে কিছু বলে। সম্ভবত না। কারন আপনি তো "মোরান" বুশের একটা বাঙালী ভার্সান হিসাবে নিজেকে ভাবেন।

ফালুজায় মার্কিন মোমায় আহত শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে পিতা

আপনার যাকে খুশী তাকে ভোট দেবেন। কিন্তু মুসলমাদের মারার জন্যে ক্রেডিট হিসাবে যখন কোন মানুষকে ভোট দিতে যাবেন তখন একবার ভাববেন কি, ইরাকে নিরীহ ৩০০০০ মানুষ কি অপরাধ করেছিল - যারা ১৯৯০ সাল থেকে আকাশ থেকে বৃটিশ আর আমেরিকান বোমার ভয় আর জমিতে সান্দাম আর তার বাথিষ্টদের ভয় নিয়ে যাপন করে অবশেষে স্বাধীনতার আর গনতন্ত্রের নামে জীবনটা দিয়ে গেল। আপনিও জানেন আর আমিও জানি কেন? কারন তারা একটা তেল সমৃদ্ধ দেশে জন্ম গ্রহন করে ছিল এবং সেটাই তাদের একমাত্র অপরাধ। যেমন হরিণের মাংস হরিণের আর ময়ূরের পালক ময়ূরের শত্রু।

আর একটা কথা বলা দরকার। সেটা হচ্ছে গনতন্ত্র। যখন বাংলাদেশের একটা গোষ্টি বন্দুক নিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে যায় বা বাংলা ভাই অস্ত্র নিয়ে ইসলাম কায়েম করতে যায় তখন তারা হয় সন্ত্রাসী। আর যখন বুশ বাহিনী ১৫০.০০০ সৈন্য, বিমান আর মিসাইল নিয়ে একটা সার্বভৌম দেশে গনতন্ত্র “Spread" করতে যায় তাকে সন্ত্রাষী বলাটাকি ভুল হবে? না । কারন অপরাধ যেই করুক সেই অপরাধী। আর যারা শুধু মাত্র একটা বিশ্বাসের কারনে একদল মানুষের বিনাশ কামনা করে তারা কি “Resist" নয়। অবশ্যই। সে বিবেচনায় মুক্তমনাদের একটা বড় অংশ রেসিষ্ট। আর মির্যা সাহেব এদের নেতা যারা দিনরাত বসে আশা করে আমেরিকান বোমার নিচের পরে সমস্ত মুসলমানরা মরে যাবে আর পৃথিবীটা মুসলমান শুন্য হয়ে যাবে। তখন তাহারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পাবেন। তা কি করে হয়? যখন মুসলমানদের মারা হবে তখন আপনিও তার দলে যাবেন কারন আপনার নামটাতে এখনও মুসলমাদের গন্ধ লেগে আছে । সময় থাকতে সেটা বদলান।

(৪)

আমি ব্যক্তিগত ভাবে ডঃ মীজান রহমানের একজন ভক্ত পাঠক। সাবলীল ভাষা আর সমাজদর্শনের প্রখরতা তার লেখাকে একটা ভিন্ন আঙ্গিকে নিয়ে গেছে। গত কয়েকদিন আগে ক্যানাডার মন্ত্রীয়লে ডঃ রহমানের জন্মদিন পালন উপলক্ষে একটা অনুষ্টানের আযোজন করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা মহান উদ্যেগ। বাংলাদেশের চিরাচরিত ধারা অনুসারে গুনীজনের মরনোত্তর সন্মানজানানোর বিপরীতে একজন গুনীমানুষ তার জীবদ্দশায় সন্মান জানানো ওকটা বিরাট বিষয় বটে। তবে যে বিষয়টা আমার খটকা লেগেছে তা হচ্ছে - বিভিন্ন পত্রপত্রিকানুসারে দেখা যায় শিশু - কিশোররা তাকে সন্মানিত করেছে, অর্থাৎ পুরো অনুষ্ঠানটিতে বাচ্চাদের ব্যবহার করা হয়েছে ডেকোরেশন পিস হিসাবে। এটা ঠিক হয়নি। আমার জানামতে মীজান রহমান বাচ্চাদের জন্যে লেখেন না। অন্যদিকে বাচ্চারা তার লেখা না পড়েই কিভাবে জানলো তিনি একজন মহান ব্যক্তি। পত্রিকায় অনুষঠানের ছবি দেখে একটা কথা মনে হয়েছে যা আফগান যুদ্ধের আগে পাকিস্থানের নিয়মিত একটা দৃশ্য ছিল। একটা মিছিলে একটা বাচ্চাকে কাধে নিয়ে যাচ্ছে একজন লোক এবং বাচ্চাটা হাতে একটা কাঠের বন্দুক। যেভাবেই হোক - বাচ্চাদের পুতুল হিসাবে ব্যবহার ঠিক নয় - বাচ্চাদের তাদের মতো বড় হতে দেওয়া উচিৎ।

গত বারে ছিল অপারেশন ক্লিন হার্ট আর তাতে গ্রেফতারে পর মারা যেত হার্ট এটাকে। এবার এসেছে ”র‍্যাব”, ”চিতা” আর “কোবরা” আর ধৃতরা মরছে ক্রস ফায়ারে। পৃথিবী ব্যাপী যে অরাজকতা চলছে তারই একটা মিনি ভার্সান এখন বাংলাদেশ সরকার চর্চা করে যাচ্ছে। যদি আমেরিকা বিনা বিচারে গোয়ান্তনামো বে’তে মানুষকে আটকে রাখতে পারে - যদি ক্যানাডা তার নাগরিকদের সিরিয়ার জেলে ফেলে রাখতে পারে তবে বাঙলাদেশ কেন পারবে না? তবে বাংলাদেশ সরকারের উচিৎ কিছু গল্প লেখক ভাড়া করে প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্যে নতুন নতুন গল্প লেখানো। কারন ক্রস ফায়ারের একই গল্প শুনে মানুষ নিজেরাই লজ্জায় পড়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে নিশ্চয় জাতীয়তাবাদী লেখকদের অভাব হবে না।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো, অক্টোবর ০৪, ২০০৪